মুর্শিদাবাদের গঙ্গা তীরবর্তী হাজারদুয়ারি প্যালেসের দরবার কক্ষে সভাসদরা শলাপরামর্শে ব্যস্ত। চারিদিকে হস্তীর চিৎকার, হ্রেষাধ্বনি আর আস্ত্রের ঝনঝনানিতে সাজ সাজ রব। এমন সময় যুদ্ধের ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রবেশ। কোষ থেকে ঝকমকে তরবারি উন্মুক্ত করে কয়েক কদম এগিয়ে এসে বাংলার জনগণের উদ্দেশে বীরদর্পে শোনালেন-

/হয় যদি বিদ্রোহ সফল
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান-
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ - অগ্র স্থান
জানিও নিশ্চিত -
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।

শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর - চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।*

ইতিহাসের রোমান্টিক পুরুষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে আমরা এমনভাবে দেখতেই প্রস্তুত। সাহস এবং বীরত্বের এক জীবন্ত নায়ক। কিন্তু এমন তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা দিয়েছিলেন কি? ইতিহাসে এমন কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। তবে এ সংলাপ কার? এ সংলাপ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের। নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তালপর্বে বাংলার চিত্ত জাগরণের উদ্দেশ্যে সিরাজকে শৌর্য - বীর্যের প্রতীক হিসেবে এমনভাবেই চিত্রিত করেছিলেন তাঁর নাটকে। এমনকি তাঁর মীরকাসিম' নাটক নিয়েও একই কথা বলা যায়। বস্তুত, এই সিরাজদ্দৌলা বা মীরকাসিমের মত নাটক থাকলে বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তার কি এত সহজেই পারত? না। কেননা তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, আর স্বদেশী ভাবাবেগ জাগ্রত করার এই নাটকগুলি ঘিরে কী প্রবল উন্মাদনা! জনরোষের ভয়ে ভীত ব্রিটিশও বসে থাকেনি। পুলিশ ও আইনকানুনের প্রয়োগে একাধিকবার নাটকের বিভিন্ন অংশের কাটছাঁট করেছে এবং শেষে অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইতিহাস আশ্রিত এমন নাটক রচিত হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কেননা, নাটক তো দূরের কথা; বাংলার ইতিহাস বলেই তখন তেমন কিছু ছিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সখেদে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।' বাংলার সুপ্ত বিবেককে জাগতে হলে, জাতীয়তাবোধের চর্চা করতে গেলে ইতিহাসের থেক বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু করা যাবে না। দেশের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। বাংলার সমাজ জীবনের সমস্যা বিবর্জিত গাজন, ঢপ, কীর্তন, পাঁচালি, বাইনাচ, খেমটা, ঝুমুর, হাফ - আখড়াই, যাত্রা ইত্যাদির বহুত চল ছিল সেসময়। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত বোধ ও সংস্কৃতির জগতে পৌঁছে দিতেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় জাতীয় নাটকের প্রকাশ। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমটির অভিঘাতে মানুষের মনন জগতের উপর যে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া! তাকে শাণিত করেই স্বদেশ প্রেরণায়উদ্বুদ্ধ নট-নাট্যকারেরা জাতীয় থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে অভিনীত হয়েছে যুগমানসের চাহিদা পূরণে বহু সফল নাটক। সে সময়ের নাট্যকারদেরও ছিল প্রাজ্ঞ অন্বেষণ। গিরিশচন্দ্র বলেন) /প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পড়লে একটা বিশেষ সত্য দেখতে পাবে -রঙ্গালয় দেশের জাতি ও সমাজকে উন্নততর স্তরে চালিয়ে নিতে কতটা সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষের প্রাণে একটা নূত প্রেরণা জাগাতে।*

রামমোহন যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যোগে যে উন্নত জ্ঞান - বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ চলছিল, সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে অবশেষে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচিত হতে লাগল। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মানুষ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাইলেন। এই উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদকে খর্ব করতে ইংরেজ ১৯০৫ সালের ১৬ অকটোবর বঙ্গবিভাগ কার্যকর করে। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়। যদিও এর অনেক আগে থেকেই বাংলাভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কেননা বঙ্গদেশেই স্বদেশ চিন্তা প্রবলভাবে আলোড়িত হচ্ছিল। ফলে বঙ্গভঙ্গের খবর শুনেই দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ -র মধ্যে হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে দু'হাজারের বেশি প্রতিবাদ সভায় সামিল হয়। স্বদেশী জিনিস গ্রহণ আর বিদেশী পণ্য বয়কট চলতে থাকে। বস্তুত, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধেমানুষ ময়দানে নেমে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের এই জোয়ার বাংলা নাট্য - আঙ্গিনাতেও আছড়ে পড়ল। নাট্যকারেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপূরক নাট্যরচনাকে কেন্দ্র করে নতুন ধারা জন্ম দিলেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৩০২ বঙ্গাব্দে নাট্যমন্দির পত্রিকায় লিখেছিলেন) /...জাতীয় উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, জাতীয়ত্বের প্রথম পবিত্র সমুজ্জল বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে নাট্য - সাহিত্য কুসুমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়াছে।* এই ধারায় রচিত হল সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার পতন, সাবাস বাঙালি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নামক সময়োপযোগী সব নাটক।

১. 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যজগতে যুগপ্রবর্তন করিয়াছিল, এই নাটকের উচ্চ প্রশংসাধ্বনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসেন।' (গিরিশচন্দ্র - অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ৩৬৯)
'মীরকাসিম' নাটক অভিনয়ের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা যায়, 'একাদিক্রমে সাতমাস কাল ধরিযা প্রত্যেক শনিবারে মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট পুরাতন হয় নাই। দর্শক সমাগমে ইহা সিরাজদ্দৌলাকেও অতিক্রম করে।' (গিরিশচন্দ্র - অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

যদিও এর অনেক আগে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে স্বদেশ ভাবনার চমকপ্রদ স্ফূরণ দেখা যায়, অসহায়নীল চাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে চাষিদের বিদ্রোহের আগুন এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে জাতীয় উজ্জীবনের ছবি দীনবন্ধু এই নাটকে কুণ্ঠাহীনভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে বিভিন্ন মামলা - মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয় এ নাটকের মঞ্চায়নে। অবশেষে স্বাজাত্যবোধের প্রতীক 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করে তার পথ চলা শুরু হল সেই নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দিয়ে ১৮৭২ সালে। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিদের দুর্দান্ত পরিবেশনায় ১৮৭২ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এর অভিনয় অভাবনীয় সাড়া ফেলে দেয়। এ নাটক দেখতে দেখতে ইংরেজদের উপর সাধারণ মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সবল গণপ্রতিরোধের নাটক বলা যায় একে। বঙ্গের বাইরে থেকেও এর ডাক আসতে থাকে। নটী বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' -এ লেখেন যে, জাতীয়তার বাণী প্রচারে তারা নীলদর্পণ নাটক নিয়ে পশ্চিমভারত পরিক্রমায় বের হন। অমৃতবাজার পত্রিকা এই নাটকের প্রয়োজন ভিত্তিক প্রচারের স্বার্থে বলে- /নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে,যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন।* এই নাটক নিয়ে মানুষের উচ্ছ্বাস এতটা ছিল যে, ১৯০১ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গোটা সময়কাল ধরেই স্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক (এমারেল্ড) ও কোহিনুর থিয়েটারে ৫৩ বার অভিনীত হয়। এই কালজয়ী মঞ্চসফল নাটক সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, /নাটকখানি বঙ্গ সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভলিব না, আবালবৃদ্ধবনিতা

আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।*

নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু'র মত অনেক শিক্ষিত মানুষ এই নাটককে অভিনন্দন জানান। এই ধারাবাহিকতার একে একে উঠে এল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটক, নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রমী' (১৮৭৪), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (১৮৭৪), মনমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) এবং উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫)।এইসব নাটকে স্বদেশিকতার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং মানুষকে তা ক্রমান্বয়ে নাড়া দেয়। সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকের অভিনয়কালে (প্রথম অভিনয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫) একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস-র কলকাতা আগমন উপলক্ষে সারা কলকাতা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পত্র - পত্রিকা তার আগমনের বিরুদ্ধে ক্ষোভব্যক্ত করে। এসবেরই মধ্যে ভবানীপুরের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রিন্সকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ বাসভবনে সাদরে বরণ করে।জগদানন্দের এই আচরণকে ব্যঙ্গ করে উপেন্দ্রনাথ দাসের পরিচালনায় 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটি লিখে অভিনয় করা হয়। এর অভিনয় পুলিশ জোর করে বন্ধ করে দেয়। তখন প্রহসনটির নাম পাল্টে রাখা হল 'হনুমান চরিত্র'। এর প্রচারও পুলিশী হস্তক্ষেপেবন্ধ হল। তখন পুলিশকে ব্যঙ্গ করে লেখা হল 'পুলিশ অব পিগ অ্যাণ্ড শিপ'। এই প্রহসনটি সহ 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করলেন উপেন্দ্রনাথ। ইংরেজদের হেনস্থা করে বারবার এমন নাটকের অভিনয় দেখার মজাও মানুষ উপভোগ করল। নাট্যজগতের এমন উদ্ধত বার - বাড়ন্তে আতঙ্কিত ইংরেজ তখন সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকটিকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করে।' নাটকের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে প্রথমে অর্ডিন্যান্স এবং ১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তা নাট্য - নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবে প্রণয়ন করে। এই আইনে বলা হয়) /যখন সরকার মনে করেন যে, এমন কোনো অভিনয়, মূকাভিনয় অথবা অন্যবিধ নাটক কোনো প্রকাশ্য স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতে পারে, যাহা - (ক) কুৎসাজনক বা মানহানিকর, অথবা (খ) বাংলাদেশ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ - ভাবের উদ্রেক করিতে পারে, অথবা (গ) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে নীতিভ্রষ্ট বা কলুষিত করিতে পারে, তখন সরকার অথবা যে ম্যাজিস্ট্রেটকে সরকার এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি আদেশের দ্বারা উক্ত অভিনয় নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।* তারপর ওই আইনে জানিয়ে দেওয়া হয়, অনুরূপ নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানের যে কোনও রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ বা সহায়তা করলে নাটকের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও ব্যক্তি এবং দর্শককে গ্রেপ্তার করে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

২। লক্ষ্ণৌতে নাট্যপ্রদর্শনের সময় নটী বিনোদিনী তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ওই লেখায়) /পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নেমতন্ন করে আনা হল। যত সব বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড়লোক, সবাই সে-দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির হল', 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সবচেয়ে সুন্দর হ'ত। সবচেয়ে জমত। সে নাটকখানি করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!...

৩। /সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের (৩/৪ গর্ভাঙ্ক) দৃশ্যটি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। পুলিশ রিপোর্ট করে যে, সম্প্রদায় দেখাইতে চায় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলেই বালিকার সর্বনাশ হইয়াছে, আর এই ঘটনায় তাহার বিবাহ হইবে না প্রমাণ করিতে চায়। এই অভিনয়ের পরেই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ মার্চ তারিখে 'সখী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হইতেছিল। পুলিশ অসিয়া উপেন্দ্রনাথ দাস (রিরেকটার), অমৃতলাল বসু - ম্যানেজার, ভুবনমোহননিয়োগী। - সত্ত্বাধিকারী মহেন্দ্র বসু, মতি সুর, অমৃতলালা মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস - অভিনেতা, রামতারণ সান্ন্যাল - সংগীত শিক্ষক প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে* (ভারতীয় রঙ্গমঞ্চঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৮০)

৪। বাংলাদেশে প্রযুক্ত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের মূল বয়ান - গাজী শামছুর রহমান কর্তৃক বঙ্গানুবাদ।

এইভাবে কণ্ঠরোধ করার প্রতিবাদে মানুষ সোচ্চার হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা (৪ চৈত্র ১২৮২) লেখে- /... সমাজ সংস্কারকরার মত যতরূপ উপায় আছে, নাটকাভিনয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। এ উপায়ে মূলে আঘাত করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। বঙ্গবাসীরা দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি উচ্চ শিক্ষা সমর্থন করা মনে করেন, দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে নাটক অভিনয়ের স্বাধীনতা সমর্থন করা তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।* কিন্তু দেখা গেল, এই আঘাতের পরে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করতে সরকার ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করল। এতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ হয়। এই দুই অ্যাক্ট একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠল। প্রথম আইন দিয়ে সরাসরি অভিনয় বা প্রদর্শনের টুটি টিপে ধরা হল এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা নাটক বা নাট্যসাহিত্যের প্রচার, প্রকাশ ও সমালোচনা করার মুখ বন্ধ করে দেওয়া গেল। এই দুই অ্যাক্টের যাঁতাকলে পড়ে নাট্য - জগতের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। এমন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তৎকালীন নট-নাট্যকাররা যে কাজ করে গেছেন এটা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় চললে মানুষের মন ভালো না। অবশেষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নাট্যকারদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এল। আন্দোলন তাদের চেতনার জগতকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিল। দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ তাঁরাও অনুভব করলেন। তাঁরা পিছিয়ে পড়ে থাকবেন কেন? দেশের তথা নিজের মান - মর্যাদার প্রশ্নে বলিষ্ঠ করে তুললেন তাঁদের ভূমিকা। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন, /দেখ যুগধর্ম বলে একটা জিনিস আছে। এই স্বদেশীযুগে যে প্রবল দেশহিতৈষণার বন্যা ছুটে আসছে, আমাদের রঙ্গালয়কেও সেইভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে দেশহিতৈষণা Preach করি। রঙ্গালয়কে powerful করতে এই একটা মস্ত সুযোগ। ... জানো, আমরা মরে যাব, কিন্তু এমন একদিন হয়ত আসবে, যখন লোকে জানবে - আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ ভুলিয়ে হিন্দু - মুসলমান প্রভৃতি সব জাতি এক করে দেশের ঐক্যমন্ত্র সাধন ও কল্যাণের জন্য কিকরেছি।* (মহাকবি গিরিশচন্দ্র - যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, পৃ ৮৩-৮৪)

৫। ১৮৭৮ সালে ইংরেজ সরকার আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রাণ তহবিলের টাকা খরচ করতে থাকে। অথচ ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষে যে ৫২ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় তার জন্য তখন সরকার ঐ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করেনি। এই আচরণের প্রতিবাদে দেশের সংবাদপত্রগুলি প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু করলেন ঐ বছরই ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যা* চালু করে তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধর্ষণের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করে।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এঁদের মধ্যে থেকেও সময়ের ডাকে সাড়া পাওয়া গেল। ফলে সমাজজীবনের আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন বিষয় তাঁদের নাটকের উপজীব্য হয়েদাঁড়াল। বিশাল ভারতভূমির জাতীয় বীরদের শৌর্য - বীর্যের কাহিনীকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে যুগোপযোগী করে নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ। পাশাপাশি তৎকালীন উত্তাল রাজনীতির কথাও অনুপুঙ্খ মেলে ধরলেন অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ। বাংলাদেশের জল হাওয়ায় পুষ্ট বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীতে স্বাধীনতা রক্ষার্থে ব্রিটিশ - বিরোধ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল সিরাজদ্দোলা,মীরকাসিম, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ, নন্দকুমার নাটকগুলিতে। আবার বহিরাগত মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাজস্থানের রাজপুত বীরদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আবেগকে, বহিরাগত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের উৎসাহিত ও সঞ্চালিত করা হ ল রাণাপ্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন নাটকে। এখানে উল্লেখ্য, এমনটা করতে গিয়ে যে মুসলিম - মানস আঘাতপ্রাপ্ত হবে, এমন ভাবার কোনও ব্যস্তব পরিস্থিতিই তখন ছিল না, যদি না ইংরেজরা সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে লিপ্ত হত। ইংরেজদের এই কুটবুদ্ধিকে সামাল দিতে নাট্যকারেরা হিন্দু - মুসলিম সম্প্রীতি অটুট রাখতে অবশ্যই বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সেই ভূমিকার কথা এ রচনার শেষদিকে আলোচনা করা যাবে। এখন উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, এইসব নাটক লিখতে গিয়ে কিন্তু, নাট্যকারেরাঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের প্রতি খুব বেশি নিষ্ঠা দেখান নি। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল ইতিহাস চর্চা নয়, ইতিহাসের উপাদানগুলিকে নিয়ে স্বদেশ প্রেমের উপযোগী করে দর্শকমনকে উদ্দীপ্ত কার। নট - নাট্যকারেরা সেই অনুভূতি তৈরি করতে পেরেছেন বলেই নাটকে দর্শকও অংশগ্রহণ করেছে অকাতরে। অবশ্য এতে প্রশাসন প্রমাদ গুণেছে। পুলিশ রঙ্গালয় ও নাট্যভিনয়ের উপর কড়া নজর রেখেছে। কিন্তু বাংলার বিদ্রোহী চেতনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি তারা। উপায় না দেখে বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ করেছে নীলদর্পণ, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী,

বাংলার মসনদ, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি নাটকগুলিকে।

এখানে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন যে, জাতীয় জাগরণের মত বিষয়ে মোগলদের রিরোধী শিবিরে দেখিয়ে মুসলিম ভাবাবেগকে আহত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কয়েকটি নাটকে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যে, তাতে হিন্দুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তারা বলেন, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) বা গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সৎনাম' (১৯০৪) নাটকের কথা। তর্কের খাতিরে এইসব নাটকে নাট্যনির্মাণ বা ঘটনা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এই নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু তখনকার উত্তেজিত সময় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য-রচনার মধ্যে ভাবগত পর্যবেক্ষণ করলে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলে নাটককে ছোট করা যায় না। অন্ততঃপক্ষে জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতা ভাবগত পর্যবেক্ষণ করলে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলে নাটককে ছোট করা যায় না। অন্ততঃপক্ষে জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সওয়াল করে মানবিক আবেদনকেরই নাট্যকারেরা তুলে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশি, এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ তার প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়ে ধর্মের সঙ্গেও আপোষ করছে। তার প্রভাব এদেশের রাজনীতিতেও কোথাও এসে পড়েছে। ফলে নাট্য পরিকল্পনাতেও সম্প্রদায়গত ভারসাম্য হয়ত কোথাও রক্ষিত হতে পারেনি; কিন্তু সবার উপরে নাট্যকারেরা মুক্তিচিন্তা হিন্দু - মুসলমান সংঘশক্তিকে সর্বতো রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, তা ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই সত্যকেসামনে রেখেই তাঁরা পথ চলতে চেয়েছেন। সে যুগে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত নলিনীকিশোর গুহের উপলব্ধি দিয়ে এর পরিমাপ করলে এই বিচারবোধ বোধহয় খুব একটা ক্ষুণ্ণ হবে না। তিনি তাঁর 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইটিতে বলেছেন, /একদল বাঙালী 'স্বদেশীযুগে' এই মনের জোরেই বিপ্লব পথে ছুটিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জন করিতে চালিয়াছিল ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে মানুষ যখন মুক্তিকে চাহে, তখন সকল সময় সকল মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না; মুক্ত হইবার ব্যাকুলতায় সে গণ্ডী ভাঙিয়াও চলে।...সেই ভাঙ্গার মুখে তাঁহাদের যে আদর্শ - নিষ্ঠা, ও দৃঢ়তা দেখি, তাহা কেবলই উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভ্রান্তি বলিয়া মনে করিতে মন সরে না, সেখানেও তাঁহাদের মুক্তির বাসনায় ব্যাকুল টাটকা তাজা চিত্তগুলি জাতীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।* তৎকালীন সমাজমনস্কের এই অনুধ্যান মাথায় রাখলে এবং নাট্যকুশলীর পরিচালনাগত মেজাজ বিবেচনা করলে সম্পাদায় নিয়ে এই তর্ক - বিতর্ক থেকেআমরা দূরে থাকতে পারবো বলেই মনে হয়।

৬। সিয়ার উল মুতাক্ষিরীণ এর লেখক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন, কাসিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে জেঁল সাহেব, ড. রমেশচন্দ্র দত্ত প্রত্যেকেই সিরাজকে দুর্বিনীত, হঠকারী ও শঠ বলে বর্ণনা করেছেন। (বাংলা নাটকের স্বদেশিকতার প্রভাত- ড. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, পৃ ৪২৪)

'As for himself, he was ignorant of the world, and incapable to take a reasonable party, Being totally destitute of sense and penetration and yet having a head so obscured by the smoke of ignorance, and so giddy and intoxicated with the fumes of youth and power and dominion that he knew no distinction betwixt good and bad, not betwixt vice and virtue.' (Seir Mutaqherin, vol. II, P. 188-189)

সিরাজদ্দৌলা নাটকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লেখেন - /বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।* (বাংলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব, পৃ ৪২১)

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে অনৈতিহাসিক তথ্যের অবতারণা প্রসঙ্গে মুখবন্ধে ক্ষীরোদপ্রসাদ বলেছেন) /ইহার ইতিহাসাংশে বিহারীবাবুর 'ইংরাজের জয়', শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'মীরকাসিম' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।* (ঐ পৃ ৫৩২)

History of the Freedom Movement in India (Vol-I) বইতে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন)" …On the whole, it is difficult to assert, with any amount of certainty, that, Nanda Kumar's action was inspired by a patriotic zeal to free his country form the yoke of the British (Do, P. 545)

'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানে তাঁহার মোহনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।* (দ্বিজেন্দ্রলাল - দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৭৫৪)

শ্রদ্ধেদেবকুমার রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালা রায়ের একান্ত সুহৃদ এবং এঁর দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন ও সাহিত্য খুব অন্তরঙ্গভাবে আলোচিত হয়েছে।

নাটক একদিন যেখানে অভিজাত বা বড়লোক বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ ছিল না, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের সূচনা করে গিরিশচন্দ্র সাধারণ মানুষের জন্য নাটককে উন্মুক্ত করে দিলেন। তারপর একে একে তৈরি হল অন্যান্য সাধারণ নাট্যশালা। তাঁর এই কৃতিত্বের পাশাপাশি তিনি শিল্প - নৈপুণ্যগুণে নাটককে করে তুললেন নব্য যুগের চালক। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন - তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেছিলেন দায়ে পড়ে - Out of sheer necessity - যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatized করা শেষ হ'ল, স্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল। (গিরিশচন্দ্র ওনাট্য সাহিত্য - কুমুদবন্ধু সেন, পৃ ১৮) ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটকদুটি। সিরাজদ্দৌলা নাটকটি ১৯০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম অভিনীত হয়। হল দর্শক সমাগমে পূর্ণ। মঞ্চ ইংরেজ বিদ্বেষী সিরাজের দৃঢ় কণ্ঠ শোনা যায় - /যাঁর হৃদয়ে ধারণা যে, স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হয়ে স্বদেশীর প্রতিঈর্ষ্যায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত! এই দৃষ্টান্ত যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায় যে, শত দোষে দোষী হলেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহলে আমাদের যুদ্ধ-শ্রম ও রণব্যয় সফল।*

স্বদেশের স্বার্থে মীরকাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করে। নাটকে মীরকাসিম তার বেগমকে লক্ষ্য করে সুতীক্ষ্ণ স্বরে বলছে) /...জান তো, আমি কাপুরুষ নই। কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, জীবন সংগ্রামে অবিরাম সংগ্রাম করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; দেশবৈরীর সহিত সংগ্রাম করতেজন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; আমার সঙ্কল্প শোনো, যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশী কবল হ'তে উদ্ধার করতে পারি, তবেই জীবন সার্থক - নচেৎ জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, জীবন বৃথা! তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী, এই উচ্চ সঙ্কল্পে সাহায্য প্রদান করো।...* মীরকাসিম নাটকের প্রথম শো হয় ১৯০৬-র ১৬ জুন ও মিনার্ভা থিয়েটারে।

গিরিশ ঘোষের এই দুটি নাটকই বিদেশী শাসনে শৃঙ্খলিত বাঙালি হৃদয়ের মর্মবেদনাকে মূর্ত করে। দুটি নাটকই জনপ্রিয় হযে ওঠে। নাটক নিয়ে আলোড়ন ব্রিটিশ প্রশাসনকে ভীত করে। তারা সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের অভিনয় বন্ধ করে দেয় যথাক্রমে ১৯১১ সালের ৮ ও ১৮ জানুয়ারি। কিন্তু দেশের মানুষ এইরকম নাটকই তো দেখতে চায়। তারা তো সিরাজদ্দৌলা ও মীকাসিমের মধ্যেই বীররসের উত্তেজনা আর বীরত্বের প্রেরণা খোঁজে! গিরিশচন্দ্র দেশের মানুষের এই মনোবাসনার কথা জানতেন। ১৯০৬ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি নবীনচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, /এখনো স্বদেশের মৌখিক অনুরাগ খুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক বা না হোক নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌখিক ঝাঁজ এখন সাধারণের প্রিয়।*

১৯০৭ এ তিনি 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটি লেখেন। মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটকের প্রথম অভিনয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৭ সালের ১৭ আগস্ট। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বলা হয় - /...শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঐসকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকেরপ্রচার করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব বর্দ্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।*

এই বিশ্বাস এবং সাধারণের আবেগকে যথার্থ মূল্য দিয়ে ঐতিহাসিক নাটকের সার্থক রূপায়ণ করেন আর এক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইতিহাস আশ্রিত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন মানুষের আশা - আকাঙ্খা, স্বপ্ন-সংগ্রামের আধারে জাতীয় আবেগকে উসকে দিতে পেরেছিলেন। 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন /...যে নাটকে বাহিরে যুদ্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে তাহা অবশ্য নাটক হতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তি সমূহের যুদ্ধ দেখায় তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক।* এখানে বৃত্তি বলতে তিনি আবেগকে বোঝাতে চেয়েছেন। সেই বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দেশপ্রেমের আবেগকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়িত করেছেন 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' নাটকে। এই নাটকগুলিই তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে আজ বিবেচিত। এই নাটকগুলিতে ইংরেজ আর মোগল সাম্রাজ্য সমার্থক হয়ে উঠেছে। বহিরাগত মোগল সম্রাট আকবরের উদ্দেশে চিতোর রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপের ক্রোধ ব্যক্ত হয়েছে- /আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায় যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরাধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও। - শিখে যাও - ধর্ম্ম যুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও - একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে যাও - দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।* বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে লেখা এই 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি এইভাবে স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা জাগিয়েছেন। স্টারথিয়েটারে এ নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৯০৫ -র ২২ জুলাই। প্রথম থেকেই এ নাটক দর্শকমন জয় করে নেয়। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিদ্যি শিক্ষার জন্য বিলাতে থাকাকালীন সেখানকার থিয়েটারের অভিনয় ও উন্নত কলাকৌশল দেখে আসেন। তাঁর নাটকের উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সেগুলি তিনি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন যা নাটককে আধুনিক করে তোলে। ১৯০৮-র ২৬ ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে 'মেবার পতন' নাটকের অভিনয় শুরু হয়। নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলি উন্নতবোধের পরিচয়ে সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তেজে, বীরত্বে, প্রেমে, মনুষ্যত্বে। মেধার পতন নাটকে তিনি একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করতে চাইলেন। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন) /...রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। ...কিন্তু নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে।* এই সত্যবতীর স্বদেশের শত্রুর প্রতি আগুন ঝরানো অভিব্যক্তি নীচের সংলাপ থেকে পাওয়া যায়)

> সগরসিংহ (রাণা অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত) ঃ সত্যবতী! মা আমার। আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখলিনে! আমি কি অপরাধ করেছি?
> সত্যবতী (সাগরসিংহের কন্যা)ঃ কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা বুঝবার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হৃতসর্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন; - যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে... নারী জাতিকে লাঞ্ছিত আর তার পুরুষ জাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে।

পাশাপাশি 'দুর্গাদাস' নাটকে (৮ ডিসেম্বর ১৯০৬, মিনার্ভা থিয়েটার) দুর্গাদাস মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে গিয়ে হীনতার পরিচয় দেন নি। রাজস্থানের মাড়বারের সেনাপতি দুর্গাদাস 'ব্যর্থ হয়েছে) পারলাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে' এই ট্রাজেডির মাঝেও মাথা নত করেনি মোগল দরবারে। বীরের এই মহান আদর্শ সে সময়ের স্বাধীনতাকামী দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটক দেখে প্রেরণা পেয়েছে বঙ্গবাসী। এর আগে (২ মে ১৯০৬) দ্বিজেন্দ্রলাল মুর্শিদাবাদের কাঁদি থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেনঃ আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি- যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের নগণ্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন- আমরা আবার জাগব, উঠব মানুষ হব।

পরাধীন ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাসই চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল। এই বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বারবার নাটকে দেখেছে। মফঃস্বল শহর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তা অভিনীত হয়েছে। যে বর্ধমানের বিজয় থিয়েটারে 'মেবার পতন' নাটক মঞ্চস্থ হয় তো খুলনার খুলনা থিয়েটারে 'রাণা প্রতাপ' অভিনীত হতে দেখা যায়। পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় তাঁর Life and Times of C.R. Das – The story of Bengali's Self – Expression বই লিখেছেন ঃ Some of the dramas of Dwijendra Lal Roy reflected the national spirit in a most imposing manner and there was hardly any important town or village in Bengal in which one or other of his works was not staged. অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় আবেগের নাটকগুলি বাংলাদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহর ও গ্রামগুলিতেই অভিনীত হয়েছিল যা জাতীয় আন্দোলনের বার্তাকে পৌঁছে দিতে পেয়েছিল জাতির মুক্তি - পিপাসু মানুষের কাছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাক্কালে স্বদেশী নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখলেন 'প্রতাপাদিত্য'। ১৯০৩-র ১৫ আগস্ট স্টার থিয়েটারে এ নাটকের অভিনয় শুরু হয়। ১৯০৪-র শেষের দিকে মিনার্ভায় এবং পরেও এর অভিনয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিবাদী কণ্ঠকে উচ্চে তুলে ধরেছে। ইতিহাসের চরিত্রগুলো সামনে এনে নিজের মত করে বীর রস ও রোমান্স রস সৃষ্টিতে তিনি নাটক রচনা করেন। বাদশা আকবরের ফরমান অনুযায়ী যশোর শাসনের অনুমতি পেলেও বিভিন্ন দিক থেকে অত্যাচারিত শৃঙ্খলিত জন্মভূমির উদ্ধারকল্পে প্রতাপের উচ্চারণ - /মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার - আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি? কেমন ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে - যেমন ক'রে হোক করতেই হবে। মান যাক, যশ যাক, প্রতিষ্ঠা যাক, তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রপদদলন থেকে রক্ষা করতেই হবে।*

প্রতাপের এই সঙ্কল্প, একাগ্রতা, মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধে রাজত্ব হারানো ভয়ে ভীত আকবরের দীর্ঘশ্বাস) /বাঙ্গালাতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হয়েছে। বাঙ্গালার বিদ্রোহ - তুচ্ছ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান!*

স্বদেশানুরাগের এই আর্তিই বঙ্গবাসীকে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনত। এটা একটা বড় প্রমাণ যে, দর্শক অভাবে যে স্টার থিয়েটারের বিপর্যস্ত অবস্থা, এই প্রতাপ আদিত্য নাটকের মঞ্চায়নে আবার তা জনসমাগমে গমগম করতে লাগল। জনগণের এই অভিনন্দনকে মাথায় নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৬০) এবং 'নন্দকুমার' (১৯৭০)। এই নাটকগুলি ওই স্টার থিয়েটারেই উল্লিখিত বছরগুলির ৪ ও ২৪ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। এছাড়াও তিনি লেখেন 'বাংলার মসনদ' (১৯১০)।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের গ্লানিকে বাংলাভাগে বাঙ্গালী হৃদয়ের যন্ত্রণার প্রতিরূপ হিসেবে দেখিয়ে এর জন্য যে জাতির হীনবল, আত্মবিশ্বাসের অভাব তথা দুর্বল চিত্তই দায়ী তা পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে তিনি তুলে ধরেছেন। এই নাটকে ক্ষীরোপ্রসাদ মনোবলের প্রয়োজনকে মোহনলালের কন্যা মতিবিবির মুখে প্রচার করেছেন - /হাজার দুই আড়াই ইংরেজদের সেপাই... নবাবের চল্লিশ হাজার সৈন্যকে দেখতে দেখতে হারিয়ে দিলে। যদি মরিয়া হয়ে তারা চেপে পড়ত, তাহ'লে সে আড়াই হাজার কোথাথাকত! এতেও বুঝতে পারছ না- মনের বলে মানুষ কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে? মনের বলের অভাবে কোটি কোটি লোকের বাসভূমি হয়েও বাঙ্গালাভূমি যেন আজ জনশূন্য।*

অর্থাৎ নাট্যকার বলতে চাইছেন, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংঘবদ্ধ হলেই যে কোনও বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। ফলে বঙ্গভঙ্গকেও রোখা যায়। আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের জন্য নিজেকে বলিদান করলেন এমন চরিত্রও নাট্যকার তুলে এনেছেন। রাজদ্রোহের অপরাধে মিথ্যা - মামলায় ফাঁসিয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ । নন্দকুমার নাটকে নন্দকুমারের চরিত্রকে সংগ্রামী তথা তার ফাঁসির ঘটনাকে শহীদের মৃত্যু হিসেবে বর্ণনা করে জাতিকে শপথ গ্রহণের আর্জি শোনাচ্চেন। তাই নন্দকুমারের ফাঁসির সময় সমবেত উত্তেজিত মানুষকে কুলগুরু বা সুদেব শাস্ত্রী বলছেন - /দেখলে? বাঙ্গালী দেখলে? খুব ভীড় করে এসেছিলে তো! খুব হায় হায় করলে - বুক চাপড়ালে - চোখের জলকে মাটি ভাসালে; কিন্তু বুঝলে কি কিছু? ব্রাহ্মণ সব কলকেতায় আজ অন্নগ্রহণ করবে না।...*

এ যেন জাতীয় শোক। এই শোকে মানুষ বিহ্বল না হয়ে ব্রত গ্রহণ করার সঙ্কল্প নেয়। যে ব্রত ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রোধকে আরও সংহত ও ক্ষুরধার করে! নাটক দেখে দর্শকও চোখের জল ফেলে। আর মেরুদণ্ড সোজা করে আন্দোলনে এগিয়ে যায়।

বঙ্গভঙ্গ - আন্দোলনের বিষয় যাদের নাটকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে এসেছে তাদের মধ্যে নাট্যকার অমৃতলাল বসু এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখযোগ্য। বিদেশী জিনিস বর্জন, স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার, কেউ বিলিতী জিনিস কিনতে গেলে তার প্রতিবাদ, স্বদেশী শিল্প স্থাপনের ভাবনা, এমনকি অন্তঃপুরের মেয়েদের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সচেতনতা ইত্যাদি ঘটনা তাদের নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। এই আন্দোলনের ধারা পুরোপুরি বিধৃত করে অমৃতলাল বসু লেখেন সামাজিক ন'া 'সাবাস বাঙালী' এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন নাট্য রূপক 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ'। অমৃতলাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বদেশী কর্ম ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের জন্য বক্তব্য রাখেন। ফলে খুব কাছে থেকে দেখা এই আন্দোলনের উত্তাপ তিনি তার নাটকে মধ্যবিত্তীয় পারিবারিক জীবনে অবিকল তুলে ধরতে পেরেছিলেন। দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারের মহাধ্যক্ষ ছিলেন অমৃতলাল; এবং এখানেই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৫। নাটকের প্রস্তাবনাতেই নাট্যকার অন্তঃপুরের বঙ্গমহিলাদের গাওয়া একটি আপত কৌতুক গীতের

মধ্যে দিয়ে সে সময়ের দুর্বার পরিবেশকে মেলে ধরেছেনঃ
আজি শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিছি বরণডালা।
হলো বাঙ্গালী ফের বাঙ্গালী, উলু দেলো বঙ্গবালা।।
(ওই দেখ) তারা পাশের দিশি ধুতি দিশি চারদ,
হ্যাট কোটের আর নাই কো আদর,
দে লো সবার গলায় মালা।।
ছি ছি একখানি কাপড়ের তরে,
বিলেত থেকে আসবে বসন
তবে লজ্জা রাখবো ঘরে,
সরমে নয় ঝরে,
বিশের শরে হৃদয় বেঁধে, ঘুচাও এ জ্বালা।।
এই নাটকে নরেন্দ্র'র মধ্যে দিয়ে সে সময়ের ছাত্র - যুবদের উদ্দীপনা প্রকাশ পায়। সে বলে) /... কিন্তু এ স্বদেশী অনুরাগ) এ জাগিয়ে দিলে কে? আমরা না খেয়ে না দেয়ে প্রাণপাত করে খাট্‌ছি, তবে তো দেশী জিনিসের কাটতি বাড়ছে! আমরাই সব করলুম, আর মুরুব্বীরা বলেন, ছেলেদের অত বাড়াবাড়ি কেন?*

এই রকম একই মেজাজের যুগোপযোগী নাটক অমরেন্দ্রনাথের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। (প্রথম অভিনয় ২৪ শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্রাণ্ড থিয়েটারে) অমরেন্দ্রনাথ কেবল অভিনেতা, নাট্যরচয়িতা বা নির্দেশক ছিলেন না। সে সময়ের নাট্যজগতের একজন প্রকৃতসংগঠকও ছিলেন। নাটক নিয়ে তাঁর ভাবনা বিশেষ মাত্রা পায়। তাঁর পরিকল্পনায় নাটকের হ্যাণ্ডবিল বা পোস্টার নতুন রূপে ছাপা হয়। নাট্যতত্ত্ব, মঞ্চ বা নাট্যপ্রয়োগ সহ নাটকের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রঙ্গালয়', মাসিক পত্রিকা 'নাট্যমন্দির' এবং 'সৌরভ' নামে আর একটি পত্রিকার প্রকাশ করেন।

এক একজন মানুষের হাতে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নাটকের রূপায়ণ ঘটেছে সার্থকভাবে। বাংলাকে ভাগ করার বিচ্ছেদ - বেদনা বাঙালির হৃদয়ে কত গভীরভাবে বিদ্ধ করেছে অমরেন্দ্রনাথ নাটকে হুজুগরামের মুখ দিয়ে তা বলেছেন) /...দেখুন আমাদের বাঙ্গালীর আর আছে কি? ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, আচার নেই, বিচার নেই, যদি বাঙ্গালীর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু থাকে। তবে দুঃখিনী বঙ্গমাতার নাম। সেই বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ!*

এই গ্লানি বুকে নিয়েই স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিয়েছে প্রতিবাদী মানুষ আন্দোলনের উন্মাদনা ঘর থেকে বের করে এনেছে ক্ষুব্ধ যুবশক্তিকে। তাই স্বদেশী কর্মীদের দেখে শপথ গ্রহণ করে বিলাস০০ /...আজ হতে আমিও তোমাদের মতঅশৌচ গ্রহণ কল্লেম। জুতা জামা বিলাসের সামগ্রী সব দূর হও। যদি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মান রাখতে চাও, অকপট হৃদয়ে শপথ গ্রহণ কর যে, 'দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোরসাধনায় দেশীয় শিল্পের উন্নতি ক'রে স্বদেশ জাত বস্ত্র দ্রব্যাদিতে গৃহ প্রয়োজনীয় সমস্ত অভাব পূরণ কর্ব্বো। আজ হ'তে আর দেশীয় পণ্যদ্রব্যে বাঙালীর ঘর সজ্জিত হবে না।'

এখানে একটি ঘটনা খুবই স্মরণয়োগ্য। গৌরবের বিষয় যে, এই নাট্য-আঙিনাতেই বাংলা সংবাদচিত্রের প্রথম মুক্তি ঘটে।এবং তাও হয় এই অমরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে। বাংলা সিনেমা বলতে তখন কিছু ছিল না। রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির নামে হীরালাল সেন কিছু কাজকর্ম করেছেন। ১৯০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতি যে বিরাট সভা হয় এবং তার আগে কলেজ স্কোয়ারে বিশাল ছাত্র মিছিল বের হয় তার ছবি তুলে রেখেছেন' হীরালালবাবু। কিন্তু দেখাবেন কোথায়? অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি এটা ক্লাসিক থিয়েটারে দেখিয়ে দিন। ২১ অক্টোবর ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ 'পৃথ্বিরাজ' নাটকের নামভূমিকায় নামার আগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ছবি প্রথম দেখানো হল। দর্শকমহল উদ্ভাসিত।

অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ পথ ধরেই এইরকম নাটক লিখেছিলেন কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নাটক 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ' (১৯০৭)। আন্দোলনের মহাযজ্ঞের উত্তাপ তারা সঞ্চালিত করতে চেয়েছিলেন এইসব নাটক রচনা ও উপস্থাপনার মধ্যে। যে উত্তাপ ক্রমশই ছড়িয়ে গিয়ে বঙ্গভঙ্গের 'settled fact' কে 'unsetled' করতে পেরেছিল।

পেশাদারী মঞ্চে এইসব নাটক যখন আলোড়ন তুলছে ঠিক তখনই স্বদেশী যাত্রাপালা দিয়ে গ্রামেগঞ্জের আপামর মানুষকেমাতিয়ে দিচ্ছিলেন চারণকবি মুকুন্দদাস। আমাদের দেশে একসময় নীচুতলার মানুষকে লোকশিক্ষা দেবার জন্য যাত্রার ব্যবহার করা হত। মুকুন্দ দাস নিজস্ব স্টাইলে অপেরাধর্মী যাত্রাপালা তৈরি করতেন এবং সেই পালা নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝখানে গিয়ে তিনিআসর জমাতেন। নাট্যকার, সাহিত্যিক, গীতিকার বলতে সাধারণত যা বোঝায়, বা আধুনিক নাট্যকলার প্রয়োগ - প্রকৌশল সম্পর্কে তিনি শিক্ষিত ছিলেন, একথা বলা যায় না। কিন্তু দেশের নিদ্রিত মানুষকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়ে, সমাজ জীবন থেকে জ্বলন্ত সমস্যা দূর করবার আকাঙ্খা থেকে এবং দেশের মানুষকে স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করতে দেশপ্রেমের আবেগে উদ্বেলিত মুকুন্দদাস বিশেষ ধরণের স্বদেশী যাত্রার উদ্ভাবন করেন। কোন আসরে কী গান গাইতে হবে বা কী বক্তৃতা দিতে হবে তা তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারতেন। ১৯০৬ সালে তিনি তাঁর প্রথম পালা 'মাতৃপূজা' রচনা করেন। দেশকে চেতনাদান কালী বা দুর্গার মূর্তিতে শোভিত করে মুকুন্দদাস দুর্বার জাগরণের গান বাঁধলেন। সুসজ্জিত আসরে শ্রোতারা প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। গেরুয়া আলখাল্লা পরে, কোমরে উত্তরীয়র গিঁট মেরে এবং মাথায় পাগড়ী বেঁধে সটান সেখানে উপস্থিত হয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্যে তিনি উদাত্তকণ্ঠে গাইতেন)

/জাগো গো জাগো গো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ তো জাগিবে না মা;
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী।*

'মাতৃপূজা' মূলত কতকগুলি সংগীত সহযোগে রচিত। তখন দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে বিশেষ করে যাত্রাপালার আসর বসত। কোনও জায়গায় গান গাইতে যাবার পথে গ্রামের লোক অনুরোধ করলে সুযোগমত মুকুন্দদাস সেখানে কে পালা গেয়ে দিতেন। বরিশালের রাজা বাহাদুরের প্রাসাদে আসর বসেছিল একদিন (১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২ বৈশাখ)। মুকুন্দদাসের অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত বললেন) /বীর হও। অন্যায়ও যদি করতে হয়, বীরের মত করো।* চিকের আড়ালে থাকা মেয়েদের দিকে সচকিত হয়ে চারণকবি সুর তুললেন) /ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,/ কভু হাতে আর প'রো না* দূর থেকে শোনা গেল কাঁচের চুড়ী ভেঙে পড়ার ঠুনঠুন আওয়াজ। যাত্রাপালার আহ্বানে দেশ যখন মাতোয়ারা, ১৯০৮ সালের এক সকালে বরিশালের রাস্তায় রাজদ্রোহের অপরাধে মুকুন্দদাস গ্রেপ্তার হলেন। বন্ধ হল মাতৃপূজা। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর অন্য কিছু ভাবার ছিল না। 'সমাজ' নামক যাত্রাপালা তৈরি করে আবার তিনি পথে বের হয়ে পড়লেন (১৩১৭ বঙ্গাব্দে শারদীয়া পুজোর আগে)। এই পালায় 'নর - সেবাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা' মন্ত্রে দীক্ষিত নগেনকে উদ্দেশ্য করে 'সত্য' নামে বিবেকের মুখ দিয়ে সমগ্র যুবসমাজকে মুকুন্দদাস শোনাচ্ছেন ঃ নগেন। সত্যই তুমি ত্যাগী! সমাজের প্রত্যেক যুবক যদি তোমার মত ত্যাগ স্বীকার করতে পারতো, তা হলে আমাদের এমন করে পদদলিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হতো না।

নারীর প্রতি অবমাননা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন ক্লেদ থেকে মুক্ত এক উন্নত জাতির আকাঙ্খা তিনি এতে করেছেন। মুকুন্দদাস বাস্তবের বিচারবোধ থেকে তাঁর পালা - রচনা সুসমৃদ্ধ করে দেশের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার পরিকল্পনা করতেন। এজন্য তাঁর অভিনয় - রীতির অভিনবত্বও লক্ষ্য করার মত। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী 'শার্ঙ্গদেব'র কথার) /মুকুন্দদাস তাঁর অভিনয়ে একজন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেটা তাঁর নির্দিষ্ট পার্ট হলেও সেটা ছিল নামেমাত্র। সেই ভূমিকাটুকুকে অবলম্বন করে নানা প্রসঙ্গে তিনি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং গান করে যেতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি তাদের নানা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, উন্নতির জন্য আবেদন করতেন। তারপরে অবার ফিরে আসতেন তাঁর ভূমিকায়। তাঁর অভিনয়গুলিতে প্রত্যেকটিচরিত্র ছিল সমাজের এক একটি বিশেষ রূপের প্রতীক। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি 'ভিলেন'কেই তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবেরূপায়িত করেছেন। এই নৈপুণ্য এবং যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য শ্রোতাদের উপর তাঁর প্রভাব যে কি বিরাট ছিল, তা না প্রত্যক্ষ করলে ধারণা করা যায় না।*

চারণকবির স্বদেশী যাত্রার এই প্রভাব প্রচ্ছায়া আজও বাংলার আকাশে - বাতাসে পাখনা মেলে ঘুরে বেড়ায়। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের জাঁকজমকপূর্ণ এলাকা সৈদাবাদের কুঠিবাড়ি বা ভৈরবতলা ঘাটের মত বিভিন্ন জায়গায় কান পাতলে আজও শোনা যায় ছন্দোবদ্ধ পদচারণার সঙ্গে মুকুন্দদাসের উদাত্ত কণ্ঠের সম্মিলনের গান -

'রাখিস রে মনে/ হিন্দু - মুসলমান ভাই দুজনে/ এক হয়ে আজ নাবতে হবে/ লাগতে হবে মা'র সেবায়।'

মুকুন্দদাসের মত এই দুই সমপ্রদায়ের সম্প্রীতির সুর ধরা পড়েছে সে যুগের নাট্যকারদের রচনাতেও। এখানে প্রশ্ন আসতেপারে, বঙ্গভঙ্গের পর্বে হিন্দু - মুসলিম বিদ্বেষ কি প্রকাশ পেয়েছিল। এই সময়ে দেখা যাচ্ছে, দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সাধারণ মানুষ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একযোগে সভা করছে, পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিচ্ছে, গাইছে বন্দেমাতরম গান।

জাতীয়তাবাদী এই বিপুল শক্তিকে ভোঁতা করে দিতেই ব্রিটিশ ফলপ্রসূ করে বঙ্গবিভাগ এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ তৈরির প্রক্রিয়া। দেশের সাধারণ মানুষ বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে থাকলেও ব্রিটিশ সরকার ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে সে সময় কিছু টাকা ধার দিয়ে বঙ্গবিভাগের পক্ষে তার মত আদায় করে। বঙ্গবিভাগের সময় নেওয়া বহু উপায়ের মধ্যে ব্রিটিশের এ এক হন্তারক পদক্ষেপ। তারা প্রচার করতে থাকে সলিমুল্লারা বঙ্গভাগ চায়। ব্রিটিশের এই কৌশলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঢাকার নেতা সরিফ খাজা আতিকুল্লা জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন, "I may tell you at once that it is not correct that the Mussalmans of East Bengal are in favor of Partition of Bengal. Real fact is that it is only a few leading Mohamedans who for their own purpose support the measure."।

(ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ঃ প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১৪০)

অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের আপামর মুসলিমরা বঙ্গবিভাগ চায়নি। কিছু অগ্রণী মুসলিম ব্যক্তি তাদের নিজ স্বার্থে এর সমর্থন করে। তবুও এই দ্বন্দ্বে সম্প্রদায়গত বিশ্বাস টোল খায়। কূটকৌশলী ব্রিটিশদের চক্রান্তই এর জন্য বিশেষ দায়ী। সেই ১৮৪৩ সালেই তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরো ইংলণ্ডে লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষে শাসন চালিয়ে যেতে গেলে হিন্দু - মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তাই সম্প্রীতির বাতাবরণকে সংহত করে পারস্পরিক বিদ্বেষ দূর করার অভিপ্রায় দেখা যায় নাটক রচনা ও উপস্থাপনার মধ্যে। সংবেদনশীল হিসেবে হিন্দু - মুসলিম মিলনবাণীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাট্যকারেরা। 'নীলদর্পণ' নাটকে কুঠিয়ালদের নিপীড়নে বাধা দিতে তোরাপ এবং রাইচরণ কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করে। হিন্দু রমণী ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের অত্যাচার থেকে বাঁচানোয় তোরাপ আদর্শ চরিত্র হয়ে ওঠে। ভ্রাতৃত্ববোধের এই বন্ধন যে অমিতশক্তিরআধার, সেই শক্তি দিয়ে ইংরেজদের চিরতরে বিদায় করা যায়। এই উপলব্ধিই গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নটকে সিরাজের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সিরাজ মিরমদনকে বলেন - /...যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু - মুসলমান ধর্মবিদ্বেষপরিত্যাগ ক'রে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়... যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়, এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব...।* দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'দুর্গাদাস' নাটকে হিন্দু - মুসলিম মিলনাত্মক রূপকে এক জাতি এক দেশ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলীর খাঁ বলেছেন) /হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে যা সংসারের কেহ কখনও দেখে নাই।* বোঝা যায়, একথা মোগল সেনাপতির নয়, স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু - মুসলিম মৈত্রীর উদার আকাঙ্খাই মূর্ত করেছেন নাট্যকার। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'বাংলার মসনদ' নাটকে নবাব আলিবর্দী যুদ্ধ যাত্রাকালে দুই সম্প্রদায়কেই ডাক দিয়ে বলেছেন) /ভাইসব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে একটি প্রার্থনা করতে এসেছি। আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী ও একমাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই সাহায্যে জয়লাভের আশা করি।* এখানেও নাট্যকার স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণতা কামনায় হিন্দু - মুসলিম মিলিতশক্তির জয়গান করেছেন। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী' নাটকে স্বদেশহিতৈষী, শিক্ষিত মুসলমান আবদুল শোভানের হৃদয়ে একই রক্তের টান অনুভূত হয়েছে। সে বলে, /...আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, চাষী মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে একমাত্রার সন্তান বলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি।* সৌভ্রাতৃত্বের এমন উদাহরণ সমকালীন নাট্যকারদের যুগচেতনার ফসল। জনজাগরণের এইসব নাটকে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে এবং মানুষকে করেছে পরিশীলিত।

একশো বছর পর আমরা এই নট - নাট্যকার - নির্দেশকদের অবদান সম্পর্কে সমকালীন সময়ের বিচারে ফিরে দেখতে চেয়েছি। স্মরণ করতে চেয়েছি তাঁদের সচেতন নাট্যক্রিয়াকে। যুগের প্রয়োজনে শোষিত শ্রেণীর পক্ষেই তাঁরা কলম ধরেছেন। পুঁজিপতিবা - সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বক্তব্য শাণিত করে তাদের রক্তচক্ষু ও দমননীতির মোকাবিলা করেছেন। শোষিত শ্রেণীর আন্দোলনকে মঞ্চে এনে নাট্য - আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন। নিপীড়িত মানুষের জীবনকে নতুন আলোয় দেখিয়ে থিয়েটারকে নতুন জীবনদৃষ্টি দান করেছেন। এদের ভাষাকে প্রেরণার জীবনরসে সিক্ত করে রস পরিবেশন করেছেন। সমৃদ্ধি সোপানে এভাবে নাটককেকরে তুলেছেন আধুনিক। যুগ প্রতিনিধি গিরিশচন্দ্রের ভাষায় তা পরিস্ফুট হয়) 'আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিই নি। যেটা feel করেছি, যে সত্য practical life এ realise করেছি, যা জীবনে মরণে পরম সত্য বলে জেনেছি তাই সবার ভিতরে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ন্যাট্যসাহিত্য, পৃ ৭৩)

আজ দেশ স্বাধীন হলেও দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণ আরও তীব্র। সাধারণ মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত। জাতিতেজাতিতে বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষও হানাহানিতে পরিণত। বেঁচে থাকার হাজারো একটা সমস্যা। মানুষের সুস্থ আশা - আকাঙ্খা নিয়ে গড়ে ওঠা নাটক দিয়ে একে রুখে দেওয়া যায় অনেকটাই। অন্ততঃ সেই স্বপ্ন এই নাট্য - আন্দোলন আমাদের দেখিয়ে যায়! আজ নাট্যমঞ্চে সেই সজীব আর্তিই গভীর হয়ে ফুটে থাকে।